এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশু অধিকার-প্রতিবন্ধী শিশু এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ড. রোকেয়া বেগম
প্রফেসর, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এসোসিয়েশন

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০২ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'শিশুর সুস্থ বিকাশ, সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস।' আমরা সবাই স্বীকার করি যে শিশু কিশোররা আমাদের অতি প্রিয়-তাদের সুস্থ বিকাশের উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির সোনালী ভবিষ্যৎ। তাদেরকে কেন্দ্র করেই পরিবার ও সমাজের কার্যক্রম এগিয়ে চলে অথচ তাদের সুষ্ঠু বিকাশ ও মঙ্গলের প্রতি যথাযথ নজর আমরা কজন রাখি! অনুকুল পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'শিশুর বিকাশে গড়ি সুরক্ষিত পরিবেশ'। আর এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন Protected, healthy, affectionate, happy and prosperous environment। শিশুর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন শিশুর বিভিন্নমুখী উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নে চলাফেরার অধিকার সুরক্ষা করা। আমরা জাতি হিসেবে কখনও উন্নতি লাভ করতে পারবনা যদি না আমরা সব ধরনের শিশু কিশোরদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি মনোযোগী হই।

কেবল উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শিশুদের অধিকারের কথা চিন্তা করলেই আমাদের চলবে না-আমাদের চিন্তা করতে হবে দরিদ্র পথশিশু, কর্মজীবি শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের কথা। স্বাভাবিক শিশু-কিশোরদের মত প্রতিবন্ধী শিশুদেরও যে নানাক্ষেত্রে অধিকার রয়েছে সে কথা হয়ত বা আমরা অনেকেই জানি না বা স্বীকার করতে চাই না। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের বাদ দিয়ে কি একটি দেশের শিশু কল্যাণ বা উন্নতি সম্ভব? কোন দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগই প্রতিবন্ধী। সে হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে আনুমানিক ১ কোটি ৪০ লক্ষ। বাংলাদেশে দারিদ্র, অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা ও মহামারীর ব্যাপকতা হিসেবের মধ্যে ধরলে এ দেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা যে আরো অনেক বেশি হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

জন্মের সময় অথবা জন্মের পরে নানারকম শারীরিক, মানসিক, বংশগতি এবং পরিবেশগত কারণে যে সমস্ত শিশু একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর মত কাজকর্ম করতে পারে না অথবা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযোজন করতে পারে না, যাদের রয়েছে শারীরিক ও মানসিক

ত্রুটি, বিকাশের ধীরগতি, শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা সাধারণতঃ সে সমস্ত শিশুকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়। এই প্রতিবন্ধী শিশুদের রয়েছে সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্যতা সাধনের অভাব। নানা ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু আছে এদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধীই প্রধান।

প্রতিবন্ধী শিশুরা এ সমাজের বিচ্ছিন্ন কোন জনগোষ্ঠী নয় এরা আপনার আমার সন্তান। তাই এই শিশুদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। কোন কারণে একজন শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবন্ধী শিশুদের সনাক্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে যত্নবান হওয়া উচিৎ। কারণ প্রথম অবস্থায় যত্নবান হলে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা যেমন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ফিরে পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধীতা কোন রোগ নয়। এটি এক ধরনের অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতাটি স্থায়ী প্রকৃতির। মানসিক প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধাঙ্ক ৭০ এর কম। তবে অনেকের তুলনামূলকভাবে অতি সামান্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আবার অনেকের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার মাত্রা অনেক বেশি। মানসিক প্রতিবন্ধকতার কোন ঔষধ নেই। তবে সযত্ন প্রশিক্ষণ এবং সহানুভূতিশীলতা মানসিক প্রতিবন্ধীদের অবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। অধিকাংশ অভিভাবকই তাঁর শিশুটি মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী এ ব্যাপারটি একেবারে মানতে চান না বা মেনে নিতে পারেন না ফলে তাঁরা একের পর এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করেন। মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তানটির মানসিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রথমে তার অভিভাবকদের মেনে নিতে হবে এবং তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেন প্রতিবন্ধী শিশুকে ব্যাঙ্গ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি যেন প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যাপারে সচেতন হয় এবং তাদেরকে নিজেদের অংশ হিসাবে ভাবে এবং সাহায্য করে যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্বাভাবিক শিশুদের মত একজন প্রতিবন্ধী শিশুও জীবনের বিভিন্ন ধাপ বা স্তর অতিক্রম করে বড় হয়। প্রতিটি ধাপে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয় তাদের মানসিক পরিবর্তন। শৈশব এবং কৈশরে এই পরিবর্তনগুলো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। শিশুদের মধ্যে যেমন শারীরিক বৃদ্ধিতে পার্থক্য দেখা যায় তেমনি দেখা যায় মানসিক এবং আচরণগত পার্থক্য। সাধারণতঃ স্বাভাবিক শিশুদের অনেকেই জীবনের বিভিন্ন ধাপগুলি বিশেষ কোন সমস্যা ছাড়া অতি সহজেই অতিক্রম করে তবে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশু ধাপগুলি অতিক্রম করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। শারীরিক সমস্যা ছাড়াও এই সমস্যাগুলির মধ্যে মানসিক, আবেগীয় এবং আচরণগত সমস্যা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের শিশুদেরও রয়েছে নানা আচরণগত এবং আবেগীয় সমস্যা এবং এর হারও অন্যান্য দেশের শিশুদের সমান। একটি গবেষণায় (বেগম, ১৯৯৩) দেখা গেছে ঢাকা শহরের স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ১০-১২ জনের মধ্যে আচরণগত ও আবেগীয় সমস্যা রয়েছে। কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে সমস্যাপূর্ণ আচরণ শতকরা ৬৩ জন শিশুর মধ্যে দেখা যায় (খুরশীদ ও বেগম, ১৯৯৭)। প্রতিবন্ধী শিশুদের নানা সমস্যাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সনাক্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমস্যাগুলি গুরুতর আকার ধারণ করবে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলি দূরীভূত হবে এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকাংশ দরিদ্র পিতামাতারা তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাবার পরিবর্তে কোন শিশুশ্রমে তাদেরকে নিয়োজিত করে অর্থ উপার্জন করাকে শ্রেয় মনে করে অথবা ভিক্ষাবৃত্তিতে ঠেলে দেয়। উপযুক্ত সময়ে স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ প্রাপ্তি ও স্কুলে পড়াশুনা করতে পারা অন্যান্য সাধারণ শিশুদের ন্যায় একজন প্রতিবন্ধী শিশুরও মৌলিক অধিকার। এ ব্যাপারে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং এই মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে এ সুযোগ করে দেয়া একান্ত কর্তব্য। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা, বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু এবং বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করতে পারা, বিনামুল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ পাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। আমরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্যে খেলাধূলা, ছবি আঁকা এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের খেলাধুলা বা চিত্তবিনোদনের কথা একবারও ভাবি না। শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। দৃষ্টিহীন শিশুদের পাশাপাশি ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রতি সুনজর দিতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে এবং

উৎসাহিত করতে উপবৃত্তি চালু করা এবং নানা প্রকার সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের সহজভাবে যাতায়াত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন হয়েছে ২০০১ সালে, সেখানে সরকারী-বেসরকারী সব পর্যায়েই প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিদিনই ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে অনেকে বাসা ভাড়া দিতে চান না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কেউ চাকুরি দিতে চায় না। প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন ও চাকুরির ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণের পাশাপাশি যাতে এর বাস্তবায়ন যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী জনগণের অংশীদারিত্ব এবং অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং আইনী বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণও জরুরি। অনেক মা-বাবা প্রতিবন্ধী শিশুর কথা লুকিয়ে রাখেন এবং তাকে অন্য লোকের সামনে আনতে লজ্জা পান বা আনতে চান না। অনেক সময় কোন কেয়ার সেন্টারে বা প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আর কোন খোঁজ খবর নেন না। এভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রথমে পরিবারের কাছ থেকে এবং পরে সমাজের কাছে নিগৃহীত হতে হতে একজন আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিতে পরিণত হতে থাকে।

স্নেহ মমতাঘন পরিবেশে একটি প্রতিবন্ধী শিশুকে সঠিক পরিচর্যা সহকারে লালনপালন করে যদি তাদের চাহিদাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় তবে একজন প্রতিবন্ধী শিশুও তার নিজের পরিবারের, সমাজের এমনকি রাষ্ট্রের জন্য কর্মক্ষম নাগরিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে বিরাট সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের তুলনায় Physical এবং mental health service facility অত্যন্ত সীমিত। আজকাল অনেক এনজিও তে প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিচর্যার জন্য নানা ধরনের service provide করে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো properly trained professional দের দ্বারা করা হয় না। প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সেগুলো হলো :

- জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সেমিনার, ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে যে সমস্ত কুসংস্কার রয়েছে তা দূরীভূত করা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রফেশনাল তৈরি করা।
- নানা ধরনের প্রতিবন্ধীতা সনাক্ত করা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ চাহিদার প্রতি নজর রেখে লালন পালনের জন্য মা-বাবাকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলের শিক্ষকদের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ যত্নের প্রতি মনোযোগ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লেখা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দূর করার জন্য মিডিয়াতে নানা অনুষ্ঠান প্রচার করা।
- কর্মমুখী শিক্ষা ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের নির্বিঘ্নে চলাফেরার জন্য ট্রাফিক পুলিশদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য যে সমস্ত সংস্থা এবং প্রফেশনাল বডি শিশুদের নিয়ে কাজ করেন তাঁদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের আগামী সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখন থেকে সবাই মিলে একত্রে কাজ করা।

যে কোন দেশে শিশুরাই হচ্ছে সে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পরিবার, সমাজ ও দেশের সমৃদ্ধিতে এ সম্পদকে কাজে লাগাবার জন্য আমাদের সবাইকে যত্নবান হতে হবে। প্রতিবন্ধীদের আমাদের বোঝা মনে না করে তাদেরকে কিভাবে সম্পদে পরিণত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুযোগ দিলে কর্মমুখী শিক্ষা ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে প্রতিবন্ধীদের পরিণত করা যায় দক্ষ জনশক্তিতে।